International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Impact Factor: 6.8
Volume-XII, Special Issue, April 2026, Page No. 70-77
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.vol.12.issue.specialW.270

বেদ ও উপনিষদে মায়া- একটি সমীক্ষা

দিব্যা চৌধুরী

গবেষিকা, বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 06.04.2026; Accepted: 07.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

This paper offers a philosophical study of the concept of Māyā in the Vedas and Upaniṣads, examining whether the roots of illusion and ignorance (avidyā) are embedded within early Vedic thought. Indian philosophy, originating from the insights of Vedic seers, is fundamentally oriented toward liberation (mokṣa) through the realization of ultimate truth (Brahman). While the Vedas primarily emphasize ritualistic and external modes of spiritual practice, the Upaniṣads shift the focus toward inward realization and metaphysical inquiry. Against this background, the paper investigates the emergence and development of the idea of Māyā across these texts.

Through textual analysis of major Upaniṣads such as the Bṛhadāraṇyaka, Chāndogya, Māṇḍūkya, and Kaṭha, the study demonstrates that although Māyā is not explicitly systematized in early Vedic literature, its conceptual seeds are present in discussions of multiplicity, perception, and the nature of reality. The paper further explores how the experience of duality, sensory perception, and cognitive limitation contributes to the formation of illusion. It argues that Māyā, often associated with divine power, conceals the non-dual reality of Brahman, while avidyā operates at the level of the individual self, leading to bondage.

The study concludes that the Upaniṣads provide a philosophical foundation for later Advaita interpretations of Māyā, emphasizing that liberation is attainable only through Brahmavidyā, which dispels ignorance and reveals the unity of existence. Thus, Māyā is not merely illusion but a crucial explanatory principle in understanding the relation between ultimate reality and empirical experience.

Keywords: Vedas, Upanishads, Māyā, Avidyā, Brahman, Advaita, Indian Philosophy

ভূমিকা:

ভারতীয় দর্শন বৈদিক ঋষির চিন্তা প্রসূত। মানব জীবনের পরম উদ্দেশ্য সিদ্ধির (দুঃখ মুক্তি ও মোক্ষ লাভের) জন্যই ভারতবর্ষে দর্শন চিন্তার উদ্ভব হয়। সত্যই সনাতন। এই সত্যকে ধারণ করার জন্য সকল সত্য অনুসন্ধানী ব্যক্তিগণ শুধুমাত্র সত্য চর্চা নয়, সত্য চর্যাকে নিজ জীবনে প্রতিষ্ঠা করে সেই পরম প্রাপ্তি মোক্ষ বা মুক্তির সাধনে অব্যাহত থেকেছেন। সত্যচর্চা ও সত্যচর্যা এই দুইয়ের সমন্বয়ে নিজ জীবনচর্যা ও চিত্তের শুদ্ধিকরণ এর দ্বারা সেই সত্য অনুসন্ধানী ব্যক্তিগণ হয়ে উঠেছেন সত্যদ্রষ্টা ঋষি। বেদ উপনিষদ ঋষি দর্শনে বিধৃত। বৈদিক দর্শনের ভিত্তি পুরোপুরি আধ্যাত্ম জ্ঞান এ জ্ঞান সত্য ও সনাতন। ফলে এই সকল বৈদিক ঋষিগণ চেয়েছিলেন সকলের মধ্যে ব্রহ্মের বিকাশ ও স্বয়ংপ্রকাশ এই ব্রহ্মের সর্বত্র অনুভূতি অর্থাৎ ব্রহ্মানুভূতি। ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি হল বেদ। ভারতীয় আর্য সংস্কৃতি শৌধের মূল ভিত্তি ও প্রাচীনতম ধর্মগ্রন্থ হল বেদ। সমগ্র বেদ উপনিষদের মধ্যে

যে অদ্বৈত তত্ত্ব বা অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ, ঘোষণা ও তার উপস্থাপনা রয়েছে সেটি আমরা বেদ, উপনিষদ পাঠের দ্বারা ও এগুলির শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসনের দ্বারা সেই শাশ্বত আত্মার যে সত্য প্রকাশ পায় তা লাভ করি। তবে এই বেদ ও উপনিষদে অদ্বয় ব্রহ্মের তত্ত্বের সাথে সাথে মায়ার ও অবিদ্যার কোনরূপ ভিত্তি বর্তমান আছে কী? সে বিষয়ে সদুত্তর ও একটি সম্যক জ্ঞান লাভের প্রয়াস এখানে করা হয়েছে।

বেদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

ভারতীয় দর্শনের ভিত্তি হল বেদ। ভারতীয় আর্য সংস্কৃতির মূল ভিত্তি ও প্রাচীন ধর্ম গ্রন্থ হল বেদ। সংস্কৃত 'বিদ্' ধাতু থেকে নিষ্পন্ন বেদ। বিদ্+ঘঞ = বেদ। 'বিদ্' ধাতু করণ এবং অধিকরণ কারকে 'ঘঞ্' প্রত্যয় যোগ করলে 'বেদ' শব্দ হয়ে থাকে। বেদ শব্দের ধাতুগত অর্থ জ্ঞান বা বিদ্যা, পরমবিদ্যা। সাধারণভাবে আমরা পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের সাহায্যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করতে পারি না। অতীন্দ্রিয় পরমজ্ঞানের তত্ত্ব বেদ থেকে লাভ করি এবিষয়ে সায়নাচার্য বলেছেন--

> "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা মা যস্তু পায়ো ন বিদ্যতে।
> এবং বেদন্তি বেদেন তস্মাদ বেদস্য বেদতা।"[১]

অর্থাৎ প্রত্যক্ষ বা অনুমানের সাহায্যে যে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয় সেই অতীন্দ্রিয় আধ্যাত্মিক জ্ঞান আমরা বেদ থেকে লাভ করি। তাই বেদকে সব গ্রন্থের সার বলা হয়েছে। বেদের সাহায্যে আমরা সেই পরম কল্যাণময় ব্রহ্ম জ্ঞান লাভ করি। বেদ ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব প্রতিপাদক অপৌরুষেও শ্রুতি বচন। বৈদিক আচার্যগনের মতে ধর্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব একমাত্র বেদ থেকেই জানা যায়। মনু বেদকে অখিল ধর্মের মূল বলে অভিহিত করেছেন 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'[২]। বেদে ধর্ম, তার সঙ্গে যুক্ত কর্ম, কর্মফল, যাগযজ্ঞ, যজ্ঞ ফল, স্বর্গ, পরলোক তত্ত্ব, অদৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞান এবং ব্রহ্ম ও মোক্ষ জ্ঞান প্রভৃতি সকল বিষয়ের জ্ঞান বেদ পাঠের সাহায্যে লাভ করা যায়। বেদ নিত্য, সত্য, স্বতঃপ্রমাণ। শ্রুতি, ত্রয়ী, আগম, ছন্দস্ বেদের প্রচলিত প্রতিশব্দ। ব্রহ্মজ্ঞান বা পরম জ্ঞানই বেদের মুখ্য অর্থ। এই বেদ অপৌরুষেয় দেশকাল দ্বারা অনবচ্ছিন্ন। হিন্দুদের বিশ্বাস বেদ অনাদি। বেদ স্বয়ং ঈশ্বরের মুখনিঃসৃত বাণী তবে বেদ নিত্য ও অপৌরুষেয়। প্রাচীন ভারতীয় উপনিষদ শাস্ত্রে বেদকে ব্রহ্ম উপলব্ধি ও আত্ম সাক্ষাৎকার লাভের অন্যতম সহায়ক রূপে গণ্য করা হয়েছে। বেদকে সকল দার্শনিক জ্ঞানের আধার বলা হয়। কারণ বেদ শাশ্বত আত্মার কথা প্রকাশ করে। এই বেদেই বিশ্বজনীন ঐক্যের মন্ত্র ঘোষিত হয়েছে। বেদের প্রথম ও প্রধান বাণী হলো আনন্দের বাণী। এ বাণী ব্রহ্ম স্বরূপের যাকে আমরা সৎ, চিৎ, ও আনন্দ রূপে জানি। অদ্বয় ব্রহ্মের প্রকাশ যে আনন্দের মধ্যে দিয়ে ব্যক্ত হয়েছে তা বেদে উল্লেখিত আছে। ঋক বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ, অথর্ববেদ এই চারটি ভাগে বেদ বিভক্ত। ঋক, সাম, ও যজুর্বেদ এই তিন বেদকে একত্রে ত্রয়ী বলা হয়। এবং বেদকে ত্রয়ী বিদ্যা বলা হয়। বেদের প্রাচীনতম অংশগুলির আবির্ভাব ও কালক্রম প্রসঙ্গে পন্ডিত মহলে অনেক মতানৈক্য দেখা যায়। ফলে বেদের প্রাচীনতার সঠিক কাল নিরূপণ নিঃসন্দিগ্ধ রূপে কোন অনুমানের দ্বারাই সত্য বলে প্রমাণিত হয় না। তবে বিশেষজ্ঞের মতে প্রচুর মতভেদ থাকলেও সম্ভবত ইন্দো আর্য সভ্যতার শুরুর দিকে বেদ রচিত হয়েছে বলে গণ্য করা হয়। বেদকে হিন্দুরা অপৌরুষেয় বলে মনে করে অর্থাৎ কোন বিশেষ এক পুরুষের দ্বারা বেদ সৃষ্ট হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে[৩] ব্যাখা পাওয়া যায় যে, এই জগত সৃষ্টির আদিকর্তা হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা যজ্ঞ কর্ম সম্পাদন করে সৃষ্টির রক্ষার জন্য অগ্নি থেকে ঋক, বায়ু থেকে যজুর্বেদ ও সূর্য থেকে সামবেদ প্রকাশ করেছিল। সে কারণে ঋকবেদের অধিষ্ঠাত্রী

---

[১] "প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা মা....."- সায়নাচার্য রচিত বেদভাষ্যভূমিকা বা ঋগবেদভাষ্য উপক্রমণিকা। ভূমিকা।

[২] 'বেদঃ অখিলধর্মমূলম্'.....- মনু সংহিতা ২/৬

[৩] শতপথ ব্রাহ্মণ, ১১/৪/২/৩

দেবতা অগ্নি, যজুর্বেদে অধিষ্ঠাত্রী দেবতা বায়ু, সামবেদের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা সূর্যকে গণ্য করা হয়। বৈদিক ঋষিদের কাছ থেকেই আমরা বেদ ও বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করি। যে ঋষির কাছ থেকে যে বেদের মন্ত্রগুলি পাওয়া যায় সেই বেদের সেই মন্ত্রগুলি সেই ঋষির নামেই শাখা রূপে বিভক্ত হয়েছে।

বেদ চারভাগে বিভক্ত ঋগ্বেদ, সামবেদ, যজুর্বেদ ও অথর্ববেদ। এই চার বেদের মধ্যে ঋকবেদই প্রাচীন ও প্রধান। কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন বাদরায়ন ব্যাসদেবকে চতুর্বেদের বিভাগ কর্তা বলে তিনি বেদব্যাস নামে পরিচিত। প্রত্যেকটি বেদের চারটি অংশ মন্ত্র বা সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ। বেদের প্রাচীন ভাগ হলো মন্ত্র আর ব্রাহ্মণ। মন্ত্রই বেদের মূলভাব। ব্রাহ্মণ তার উপব্যাখ্যান। আরণ্যক সুগভীর তত্ত্বানুসন্ধানে সহকারি। উপনিষদ ব্রহ্মজ্ঞানের অন্তর্গত। বেদ মন্ত্র তিন প্রকার ঋক, সাম, যর্জু। যজ্ঞে হোতা, উদগাতা ও অধর্বয্যু, এই তিন প্রকার পুরোহিত বেদ মন্ত্র উচ্চারণ করেন এবং ব্রহ্মা এই যাগযজ্ঞ পরিচালনার দায়িত্বে থাকেন। সংক্ষেপে বলতে গেলে বলতে হয় ঋক পদ্য, যজুঃ গদ্য, আর সামবেদ গান। ঋকবেদের সুরেই সাম রচিত হয়। মন্ত্র বলতে বোঝায় যার দ্বারা মনন করা হয় তাই মন্ত্র। নিরুক্তের রচয়িতা যাস্ক বলেন মনন থেকেই মন্ত্রের উৎপত্তি। মন্ত্র থেকেই মননকারি ব্যক্তিবর্গ আধ্যাত্ম্য বিষয়ে চিন্তা করে থাকেন। ব্রাহ্মণ সম্পর্কে বলতে গেলে ব্রাহ্মণ শব্দের বিভিন্ন ব্যুৎপত্তি ও ব্যাখ্যা রয়েছে। বেদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ সম্বন্ধযুক্ত হয়। যজুর্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণে বলা হয়েছে '[৪]ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ' অর্থাৎ ব্রহ্মণ্ই হলেন ব্রাহ্মণ। আরণ্যকে যে জ্ঞানযোগ ও আধ্যাত্ম্য বিদ্যার সূত্রপাত উপনিষদ তার পরাকাষ্ঠা। '[৫]অরণ্যে উক্তমিতি ইতি আরণ্যকম্' অর্থাৎ যা অরন্যে উক্ত হয় তাই আরণ্যক। অরণ্যে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও শিষ্যগণ আধ্যাত্ম বিদ্যার জ্ঞান লাভ করার জন্য আচার্যগণকে যে প্রশ্ন করে সেই বিদ্যা যে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করা হয় তাই আরণ্যক। উপনিষদ হল বেদের সর্বশেষ অংশ, সমস্ত বেদের সারাংশ। যে পরম জ্ঞান লাভ করে তার নাম উপনিষদ। বেদের ব্রাহ্মণ ভাগ্যে অবলম্বন করে পূর্ব মীমাংসা এবং উপনিষদকে অবলম্বন করে উত্তর মীমাংসার রচিত হয়েছে। যার অপর নাম শ্রুতি। শ্রুতিকে আয়ত্ব করার সাধন অঙ্গ হল বেদাঙ্গ ছয় প্রকার বেদাঙ্গের আমরা উল্লেখ পাই। শিক্ষা,কল্প, নিরুক্ত, ছন্দ, জ্যোতিষ, ব্যাকরণ। শিক্ষা ও ব্যাকরণের রচয়িতা পানিনি, কল্পের রচয়িতা বিভিন্ন ঋষিগণ, ছন্দের রচয়িতা পিঙ্গলাচার্য, নিরুক্তের রচয়িতা যাস্ক, জ্যোতিষের রচয়িতা গর্গ। এই ছয় বেদাঙ্গের সাধনের দ্বারা আমরা বেদের যথার্থ জ্ঞান লাভ করি। শিক্ষায় বর্ণের বিশুদ্ধ উচ্চারণ সম্পর্কে নিয়মাবলী বর্ণিত আছে। ব্যাকরণে শব্দের ব্যুৎপত্তি, পদ প্রভৃতি বিষয়ে নিয়মাবলী বর্ণিত আছে। নিরুক্তে বৈদিক শব্দাদির যোগার্থ নিরূপণ করা হয়েছে। ছন্দতে বৈদিক পদ্যের নিয়মাবলী বিশ্লেষিত হয়েছে। জ্যোতিষে গ্রহ নক্ষত্রাদির স্থান ও গতির সূত্র বর্ণিত হয়েছে। কল্প সূত্র, শ্রৌত সূত্র, ও গৃহ সূত্র এই তিনটির সমষ্টি। এই ছয় প্রকার বেদাঙ্গগুলি সূত্র আকারে বর্ণিত হয়েছিল। মনে রাখতে হবে বেদ ও বেদাঙ্গ নিয়ে বৈদিক সাহিত্য। বেদের বিভিন্ন শাখার কথা আমরা পেয়ে থাকি তাদের মধ্যে ঋষি শৌনকের *'চরণব্যূহসূত্রম'* গ্রন্থ অনুসারে ঋগ বেদে পাঁচটি শাখা, যজুর্বেদে ছিয়াশী শাখা। সাম বেদের হাজার শাখা রয়েছে। অর্থব বেদের নয়টি শাখা পাই।

বৈদিক ঋষিগণ জাগতিক দুঃখের অসহনীয়তার ব্যাপারে বিশেষরূপে অবগত ছিলেন। এবং এই জাগতিক দুঃখ কষ্টের নিবৃত্তির জন্য মুক্তির পথ অন্বেষণ ও জ্ঞান লাভই ছিল তাদের অন্যতম সাধনা। পরিপূর্ণ জ্ঞান এবং দুঃখ মুক্তির শান্তি এই উভয় ছিল বেদের লক্ষ্য। এপ্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দের কথায় প্রকাশ পায় মানুষের পক্ষে পরমপদ ও মুক্তি লাভের জন্য যা কিছু আবশ্যক তা সকল বেদেই বিদ্যমান। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন দার্শনিক ও মনিষীগণ বেদের গুরুত্ব মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে। বৈদিক সাহিত্যে দুটি বিভাগ জ্ঞানকাণ্ড এবং

[৪] *"ব্রহ্ম বৈ ব্রাহ্মণঃ....."*-শুক্ল যজুর্বেদ শতপথ ব্রাহ্মণ,১৩/৪/১/১৫

[৫] *"অরণ্যে উক্তমিতি....."* সায়নাচার্য, তৈত্তিরীয়আরণ্যক ভাষ্যে, উপক্রমণিকা, ভূমিকা

কর্মকাণ্ড। এই দুটি বিভাগের মধ্যে যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠান, বিধি, নিষেধ, অপূর্ব, অদৃষ্ট এবং বেদ বিহিত বিভিন্ন কর্মের উল্লেখ কর্মকাণ্ডে পাওয়া যায়। অপরদিকে জ্ঞানকাণ্ডে ব্রহ্ম, ব্রহ্মজ্ঞান এইসকল বিষয়ে বিভিন্ন তত্ত্বের আলোচনা করা হয়েছে।

উপনিষদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়:

উপনিষদকেও ভারতীয় চিন্তাধারা ও আর্য সংস্কৃতির ধারক ও বাহক বলা হয়েছে। বেদের প্রান্তে বা শেষে অবস্থান বলেই তার নাম উপনিষদ। উপনিষদ বেদের সর্বশেষ অংশ হওয়ায় একে বেদান্ত বলা হয়। উপনিষদ শুধুমাত্র কোন দার্শনিক গ্রন্থ নয়, বরং সেই আধ্যাত্মিক সত্য জ্ঞান যেগুলি সত্যদ্রষ্টা ঋষিদের দ্বারা উপলব্ধ হয়েছে। সাধারণত মন্ত্র বা সংহিতা, ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদের সূচনা হলেও, জেনে রাখা প্রয়োজন যে ব্রাহ্মণের শেষ পর্ব যেমন আর্যণকে ধরা হয়। সেরূপ আরণ্যকের শেষ অংশ হল উপনিষদ। আরণ্যকে যে বিষয়গুলির ধারণা পাওয়া যায়, সেগুলিরই দার্শনিক তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণী ব্যাখ্যা আমরা উপনিষদ অংশে পেয়ে থাকি। উপনিষদ হল বেদের সর্বশেষ অংশ, সমস্ত বেদের সারাংশ। উপ-নি-সদ্ ধাতু কিপ্ প্রত্যয় করে উপনিষদ শব্দটি নিষ্পন্ন হয়েছে। গুরুর কাছে অর্থাৎ নিকটে উপবিষ্ট হয়ে শিষ্য যে পরম জ্ঞান লাভ করে তার নাম উপনিষদ। উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারা বিশ্বের বহু মনীষীকে অনুপ্রাণিত করছে। ফলে উপনিষদের উপর বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যাখ্যা আমরা এইসকল মনীষীদের থেকে পেয়ে থাকি। উপনিষদের সংখ্যা অনেক। মুক্তিকোপনিষদে ১০৮ টি উপনিষদের নাম উল্লেখ আছে তবে বর্তমানে ১১২ টি উপনিষদের নাম আমরা জানতে পারি। এগুলির মধ্যে বৃহদারণ্যক, শ্বেতাশ্বতর, ছান্দোগ্য, ঐতরেয়, তৈত্তিরীয়, কৌষীতকি, ঈশ্, কেন, কঠ, প্রশ্ন, মুন্ডক, মান্ডুক্য, এই বারোটি উপনিষদ প্রাচীন ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপনিষদ গুলির বেশিরভাগ বৈদিক সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে সংযুক্ত। কোনোটিই বা সংহিতা অংশের সঙ্গে কোনোটি বা ব্রাহ্মণের সঙ্গে কোনোটি বা আরন্যকের সঙ্গে। আদিগুরু শংকরাচার্য্য কৌষীতকি উপনিষদ ছাড়া বাকি ১১টি উপনিষদের ওপর ভাষ্য রচনা করেছিলেন। উপনিষদে যে চিন্তাধারার ক্রমবিকাশ বিভিন্ন ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয় অদ্বৈত বেদান্তের নির্যাস। উপনিষদের দার্শনিক চিন্তাধারার মূলে রয়েছে অদ্বৈতবাদী চিন্তাধারার অস্তিত্ব। এক ও অদ্বিতীয় চৈতন্য সত্তার অস্তিত্বই উপনিষদে অবস্থিত অদ্বৈত তত্ত্বের মূল কথা। তবে বেদ উপনিষদে যে চিন্তা ধারার ক্রমবিকাশ লক্ষ্য করা যায় তার মধ্যে একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল বেদ ও উপনিষদের দর্শনের মধ্যে ব্যবহারিক দিকের পার্থক্য বর্তমান। বেদে যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কথার উল্লেখ পাওয়া যায় তা সম্পূর্ণরূপে বর্হিমুখী আর উপনিষদে যে আধ্যাত্মিক অনুশীলনের কথা উল্লেখ আছে তা সম্পূর্ণরূপে অন্তর্মুখী। আত্মোপলব্ধির জন্য চিন্তার যে অন্তর্মুখীতার প্রয়োজন তা উপনিষদ সর্বাগ্রে স্বীকার করে।

বেদ ও উপনিষদে মায়া:

বেদ ও উপনিষদে মায়া ও অবিদ্যা কোন ভিত্তি খুঁজে পাওয়া যায় কি না এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা দেখতে পাই যে মায়া ও অবিদ্যার ভিত্তি হল মুক্তিস্পৃহা। এই স্পৃহা থেকে বাস্তব জীবনকে উপেক্ষা। এই আলোচনাকালে একটা বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে মায়া সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের সাথে সম্পর্কিত অপরদিকে অবিদ্যা সম্পূর্ণরূপে জীবের সাথে সম্বন্ধিত তবে দুই ক্ষেত্রেই সত্য লুকিয়ে থাকে বা আবরিত থাকে ও মিথ্যার অভিজ্ঞতা হয়। আমরা যখন উপনিষদগুলির বিস্তারিত পর্যালোচনা করি তখন দেখতে পাই যে তার মধ্যে মায়াবাদের বীজতত্ত্ব তপ্ত হয়েছে মান্ডুক্য উপনিষদে। এই উপনিষদে ব্রহ্মের চারটি অবস্থার বর্ণনা আছে এই চারটি অবস্থার ব্যাখ্যা প্রসঙ্গেই মায়া ও অবিদ্যার তত্ত্ব অবতারিত হয়েছে। জাগ্রত, স্বপ্ন, সুষুপ্তি, ও তুরীয় এই চারটি অবস্থার বর্ণনা আমরা উপনিষদে পেয়ে থাকি। এখানে জাগ্রত অবস্থা ও স্বপ্নাবস্থায় মানুষের মন একক বস্তু হলেও তা দ্বৈতভাগ সৃষ্টির ক্ষমতা রাখে। সে কারণে জাগ্রত অবস্থায় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে জগত আমরা দেখি তা অনুরূপভাবে কল্পনার বস্তু হতে

পারে এই ধারণা বা প্রত্যয় থেকে এই মায়াবাদের উৎপত্তি। বৃহদারণ্যক উপনিষদে[৬] বলা হয় যা পরমতত্ত্ব নয় তাকে অসৎ, অন্ধকার এবং মৃত্যুর সাথে তুলনা করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে একটি ঋকে মায়ার প্রসঙ্গ বর্তমান। সেই ঋকটি ঋকবেদের ষষ্ঠ মন্ডল হতে গৃহীত। ঋকটিতে বলা হয়েছে:-

"রূপং রূপং প্রতিরূপো বভূব
তদস্য রূপং প্রতিচক্ষণায়।
ইন্দ্র মায়াভিঃ পুরুরূপ ঈয়তে
যুক্তা হাস্য হরয়ঃ শতা দশ।।" [৭]

অর্থাৎ পরমেশ্বর বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়েছেন। তিনি মায়াবশতঃ বহু রূপে অনুভূত হন। পরমেশ্বর নানা রূপ ধারণ করে পৃথক পৃথকভাবে আত্মা প্রকাশ করে থাকেন তিনি মায়ার দ্বারাই বহুরূপ ধারণ করেছিলেন। ইন্দ্রের রথে যুক্ত অশ্ব সংখ্যা এক হাজার বলা বাহুল্য এই ঋকটি যে সুক্ত থেকে গৃহীত তার প্রধান দেবতা ইন্দ্র। ঠিক সেরূপ জীবাত্মার দেহে শত শত ইন্দ্রিয় সকল রথে অশ্বের মত সংযোজিত আছে। ঋকবেদে ইন্দ্রের প্রশস্তি হিসেবেই প্রসিদ্ধ। এখানে বৈদিক ঋষির একটি পূর্ব স্বীকৃতি ছিল তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে যিনি মায়ার দ্বারা বহুরূপে প্রকাশিত হন তিনি ব্রহ্মা। তবে এখানে 'হরি' বা 'অশ্ব' শব্দের উল্লেখ থেকে ইন্দ্রের কথার একটি সহজ অর্থ ছিল তাঁর রথে ছিল এক হাজার অশ্ব। এখন প্রশ্ন হল এক ইন্দ্র কিভাবে বহুরূপে প্রকাশিত হন? তার উত্তরেই এখানে বৈদিক ঋষি ইন্দ্রের যাদু শক্তির উল্লেখ করেছেন এখানে যাদুশক্তি বলতে স্পষ্ট তো এই মায়াকে বোঝানো হয়েছে শঙ্করাচার্যকে দেখা যায় তার রচিত বৃহদারণ্যক উপনিষদের ভাষ্যে এই উদ্ধৃতিটিকে মায়াবাদের সমর্থনে তিনি ব্যবহার করেছিলেন। তিনি ইন্দ্রর অর্থ করেছেন পরমেশ্বর, মায়াবী শব্দের অর্থ করেছেন নানারূপ সৃষ্টি মিথ্যা অভিমানের দ্বারা, হরি বলতে তিনি বুঝিয়েছেন ইন্দ্রিয়কে। মায়াবাদের এরকম ব্যাখ্যায় গ্রহণ করেছেন তিনি। শব্দার্থ অনেক সময় প্রসঙ্গ নির্ভর হয়ে থাকে এই প্রসঙ্গে একটি প্রশ্ন ওঠে যে উপনিষদকার কি প্রসঙ্গে এই উক্তিটি করেছিলেন? দেখা যায় বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় অধ্যায়ের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় হলো বহু রূপে যে বিশ্ব প্রকটিত তা ব্রহ্মেই আশ্রিত। এর অব্যবহিত পূর্বেই উপনিষদকার বলেছেন, এই আত্মায় সকল ভূত সকল, সকল দেব, সকল লোক, সকল প্রাণ, সকল মানবাত্মা আশ্রিত। এই উক্তিটিতে এমন কোন ইঙ্গিত নেই যে বহু বস্তু, বহু লোক, বহু জীব, এর কোন পরমার্থ নেই। এরা মায়া শক্তি দ্বারা রচিত অবভাস। [৮]ছান্দোগ্য উপনিষদে বলা হয়েছে, সকল বস্তু সমূহের পরিণাম নাম অবলম্বনে অবস্থিত নামমাত্র। শ্বেতাশ্বতর উপনিষদে 'মায়া' শব্দটিকে ভ্রান্তি অর্থে গ্রহণ করা হয়েছে এবং সেখানে ঈশ্বরকে মায়াবী বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। [৯]বৃহদারণ্যক উপনিষদে, বলা হয়েছে পরমেশ্বর মায়াবশত বহু রূপে অনুভূত হন। সুতরাং যদি প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উক্ত উদ্ধৃতিটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করতে হয়। তাহলে বলতে হবে ঋকবেদে বর্ণিত ইন্দ্র যেমন মায়ার দ্বারা বহু রূপ ধারণ করেন তেমনি ব্রহ্মও মায়ার দ্বারা বহু রূপ ধারণ করেন। কিছু উপনিষদকারের বক্তব্য অবশ্য এই নয় যে ব্রহ্ম মায়া দ্বারা বহু হয়েছেন। এই প্রসঙ্গে উপনিষদকারের আরেকটি উক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। উপনিষদকার বলেছেন, যে অসংখ্য সত্তা আমরা দেখি তা সকলই ব্রহ্ম। অনেকে মনে করেন, উপনিষদের এই উক্তিগুলি মায়াবাদের ঠিক প্রত্যক্ষ সমর্থন তবে মায়াবাদের সমর্থনে পরোক্ষভাবেও কিছু উক্তি পাওয়া যায়। সেগুলি হল নিম্নরূপ:-

---

[৬] বৃহদারণ্যক উপনিষদ ,১/৩/২৮

[৭] *"রূপং রূপং প্রতিরূপো..."* বৃহদারণ্যক উপনিষদ ২/৫/১৯

[৮] ছান্দোগ্য,৬/১/৬

[৯] বৃহদারণ্যক,২/৫/১৯

ছান্দোগ্য উপনিষদ থেকে জানা যায় ব্রহ্মবিদ্যার জ্ঞান বিষয়ে বলা হয়েছে, 'ভূমা' সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা আমরা পাই সেখানে বলা হয়,

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং।"[১০]
অর্থাৎ যা ভূমা সেটিই সুখ অল্পে সুখ নেই কেবল ভূমাতেই সুখ।

এই অনুভূতিকে সম্ভব করতে হলে দুটি ভিন্নধর্মী সত্তার প্রয়োজন। যে মতবাদে একথা স্বীকার করে নেওয়া হয় তাকে বলে দ্বৈতবাদ। দ্বৈতের একটি জ্ঞাতৃস্বরূপ। যা জানবার ক্ষমতা রাখে, অপরটি জ্ঞেয় বা জানার বিষয়, এই জ্ঞাতৃ- জ্ঞেয় সম্বন্ধের ভিত্তিতে এই বিশ্বের বিচিত্র রচনা সম্ভার প্রকটিত হয়। দ্বৈতবোধের অভাবে এই সম্ভার প্রকটিত হতে পারে না। তবে দ্বৈতের ভিত্তিতে যার প্রকাশ তার সীমা আছে। কারণ জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয় পরস্পরের সীমা টেনে দেয়। দ্বৈতের বাইরে যার প্রকাশ তা সীমাহীন হতে পারে। সেকারণে সে ভূমা। তবে এখানে দ্বৈতের ভিত্তিতে যার প্রকাশ তা যে মিথ্যা সেকথা ইঙ্গিতেও বলা হয়নি।

তবে বৃহদারণ্যক উপনিষদে সে কথার ইঙ্গিত আছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের দ্বিতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে যাজ্ঞবল্ক্য মৈত্রেয়ীকে ব্রহ্মবিদ্যা সম্বন্ধে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেখানেও বিভিন্নভাবে সেই কথাই বলা হয়েছে। অবশ্য সামান্য ভিন্নতার তাৎপর্য যে অনেকখানি তা আমরা স্বীকার করে থাকি সেখানে বলা হয়েছে।

"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং জিঘ্রতি
তদিতর ইতরং পশ্যতি তদিতর ইতরং শৃণোতি.....
যত্র বাস্য সর্বমাত্মবভূত তৎ কেন কং জিগ্রেৎ তৎ
কেন কং পশ্যেৎ তৎ কেন কং শৃনুয়াৎ.....
বিজ্ঞাতারমরে কেন বিজানীয়াৎ।"[১১]

অর্থাৎ যেখানে দ্বৈততা আছে সেখানে একজন আরেকজনকে আঘ্রাণ করে। একজন অপরকে দেখে। একজন অপরকে শোনে কিন্তু যেখানে আত্মা ভিন্ন অন্য কিছুই থাকে না সেখানে কে কাকে অঘ্রাণ করবে, কে কাকে দেখবে? কে কাকে শুনবে? বিজ্ঞাতা জিজ্ঞাসা কে জানা যাবে কিভাবে? যাজ্ঞবল্ক্যের 'দ্বৈতমিব' শব্দটির তাৎপর্য লক্ষণীয়। এর অর্থ দুয়ের মতো। এর থেকে মনে হয়, যাজ্ঞবল্ক্য বলতে চেয়েছেন দ্বৈতভাবটা যেন ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ বা অবস্থা সূচিত করে না। এটি একটি ইতর অবস্থার মতো । তাই যদি হয়, তাহলে দ্বৈতবোধের ভিত্তিতে বহুধাও বৈচিত্র্য মন্ডিত রূপে ব্রহ্মের যে পরিচয় আমরা অভিজ্ঞতায় পাই তা যেন ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপের পরিচায়ক নয়। আর দ্বৈতভাবহীন অবস্থায় ব্রহ্মের যে রূপটির কথা তিনি উল্লেখ করেছেন তাকে বিজ্ঞাতা বলে অভিহিত করেছেন। যাজ্ঞবল্ক্যের কথাগুলি বিশ্লেষণ করলে ব্রহ্মের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তার বৈশিষ্ট্য দুটি:-

১) ব্রহ্ম অখণ্ডভাবে সত্য এবং
২) ব্রহ্মের অখন্ডরূপই জ্ঞতৃরূপ, নানা দ্বারা খন্ডিতরূপ তার প্রকৃত রূপ নয়।

মায়াবাদের প্রতিপাদ্য বিষয় দুটি-

১) ব্রহ্মের অখন্ডতা ও চিন্ময় স্বভাব এবং
২) ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ নয়, তা স্বপ্নবৎ অলীক।

কঠ্ উপনিষদের একটি বচন মায়াবাদকে আংশিকভাবে সমর্থন করে। ব্রহ্মের মূর্তরূপ পরিবর্তনশীল ও বিনাশ প্রবণ। আর ব্রহ্মের অমূর্তরূপ স্থির, অচঞ্চল, এবং ভোক্তৃভোগ্য সম্পর্ক রহিত। এখানে ব্রহ্মের অমূর্ত রূপের

[১০] *"যো বৈ ভূমা তৎ....."* ছান্দোগ্য উপনিষদ, ৭/২৩/১
[১১] *"যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি তদিতর....."* বৃহদারণ্যক উপনিষদ, ২/৪/১৪

প্রতি ইঙ্গিতবাহী একটি বর্ণনা পাওয়া যায়।সেই বর্ণনায় ব্রহ্মের নানা ও বহু রূপে অভিব্যক্ত রূপের প্রতি অনাস্থার। বর্ণনাটি এইরূপ-

"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং।
তথাহরসং নিত্যমগন্ধবচ্চ যৎ।।
অনাদ্যনন্তং মহতঃ পরং ধ্রবং।
নিচায্য তন্মৃত্যুমূখ্যাৎ প্রমুচ্যতে।।"[১২]

অর্থাৎ যিনি শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধবিহীন। তিনি অশব্দ, তিনি অস্পর্শ, তিনি অরূপ এবং অব্যয়। তার স্বাদ গ্রহণ করা যায় না। তিনি নিত্য এবং অগন্ধা। তিনি অক্ষয়, শাশ্বত, অনাদি, অনন্ত, যিনি মহৎ থেকে বিলক্ষণ ও তিনি কূটস্থ নিত্য। এই উপনিষদেই বলা হয়েছে যে ব্রহ্মই সকল ভূতে প্রচ্ছন্নরূপে বিদ্যমান। তার পৃথক কোন প্রকাশ নেই। এইভাবে বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মান্ডুক্য, কঠ্ প্রভৃতি উপনিষদে বিভিন্ন প্রসঙ্গে মায়ার কথা বলা হয়েছে।

উপসংহার:

ভারতীয় দর্শনে 'সত্য দর্শন' বা 'তত্ত্ব দর্শন' কে প্রধান বিষয় হিসেবে গণ্য করা হয়। যে সত্য বা তত্ত্ব সমগ্র বিশ্বে নিহিত যার থেকে এই বিশ্বের চেতন অচেতন সকল কিছুই উদ্ভূত ভারতীয় দার্শনিকগণ সেই পরম সত্যকে দর্শন করতে চান, উপলব্ধি করতে চান ও নিজের জীবনে প্রতিষ্ঠা করতে চান। সেকারণে ভারতীয় দর্শনে জ্ঞান ও মননের সঙ্গে আচরণের সমন্বয় সাধনের চেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য সম্ভারের যে উৎকর্ষতা ও প্রাচুর্য্যতা তা বেদ উপনিষদকে কেন্দ্র করেই। হিন্দু ধর্মের বিভিন্ন গ্রন্থের মধ্যে বেদের স্থান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। বেদ ধর্মতত্ত্বের আদি ও মূল ভিত্তি। বৈদিক সংস্কৃত প্রাচীনতম আর্য্যভাষা ও বেদ মানবজাতির আদি গ্রন্থ। ভারতীয় দর্শনের ষড় আস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ের কেন্দ্র বেদ। এবং বৌদ্ধ ও জৈনের মত নাস্তিক দর্শন সম্প্রদায়ও তাদের তত্ত্ব প্রতিষ্ঠার কালে বেদ উপনিষদ দ্বারা কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রভাবিত। বেদের অন্ত ভাগকে উপনিষদ বলে। উপনিষদে যে মায়াবাদের বীজ পরিলক্ষিত হয় তা অস্বীকার করা যায় না। কঠ্ উপনিষদে যা কিছু বিদ্যা ও যা কিছু অবিদ্যা বলে খ্যাত হয় তারা উভয়েই ভিন্নধর্মী এবং অত্যন্ত বিরুদ্ধ পথগামী। নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে অবিবেক হল অবিদ্যা। বিদ্যা হল সেই নিত্য ও অনিত্য বস্তুর মধ্যে যা বিবেক। অবিদ্যা হল অজ্ঞান ও বন্ধনের কারণ। অপরদিকে বিদ্যা হল সেই অজ্ঞান থেকে ও বন্ধন থেকে মুক্তির কারণ। উপনিষদে বলা হয় অবিদ্যাবশত জীব নিজেকে দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধির সঙ্গে অভিন্ন মনে করে যার ফলে বন্ধন দশা ভোগ করে। এবং প্রকৃত অর্থে সেই জীব যখন উপলব্ধি করে যে সে ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছু নয় অর্থাৎ ব্রহ্ম থেকে সে স্বরূপত অভিন্ন তখন সে প্রকৃতপক্ষে মুক্ত হয়। অবিদ্যা প্রসূত কর্ম কখনই মুক্তি লাভে সহায়ক হয় না। একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যাই মায়া ও অবিদ্যা হতে যে বন্ধনের সৃষ্টি হয় সেই বন্ধন থেকে মুক্তি প্রদানে সক্ষম। এইভাবে বেদে ও বিভিন্ন উপনিষদে যথা বৃহদারণ্যক, ছান্দোগ্য, মান্ডুক্য, কঠ্ প্রভৃতি উপনিষদে মায়ার প্রসঙ্গ পরিলক্ষিত হয়।

[১২] *"অশব্দমস্পর্শমরূপমব্যয়ং.....,* কঠ্ উপনিষদ,১/৩/১৫

গ্রন্থপঞ্জী:

১) গম্ভীরানন্দ, স্বামী। (সম্পা.ও অনু.) *কঠ উপনিষদ*। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়,২০১২।

২) বন্দ্যোপাধ্যায়, মানবেন্দ্র। (সম্পা.ও অনু.) *মনু সংহিতা।* কলকাতাঃ সংস্কৃত পুস্তক ডিপো, ২০০৯।

৩) স্বামী সত্যপ্রকাশ এবং পণ্ডিত সত্যকাম বিদ্যালঙ্কার, সম্পাদক। *শতপথ ব্রাহ্মণ* । বিজয়কুমার গোবিন্দ রাম হাসনন্দ, ১৯৯৮।

৪) গম্ভীরানন্দ, স্বামী। সম্পা. *বৃহদারণ্যক উপনিষদ*। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়, ২০১৭।

৫) গম্ভীরানন্দ, স্বামী। সম্পা. *ছান্দোগ্য উপনিষদ*। কলকাতাঃ উদ্বোধন কার্যালয়,২০১২।

৬) গম্ভীরানন্দ, স্বামী। *উপনিষদ গ্রন্থাবলী* প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, ও তৃতীয় ভাগ। উদ্বোধন কার্যালয়। কলিকাতা।

৭) সেনগুপ্ত, প্রমোদবন্ধু। *ভারতীয় দর্শন* তৃতীয় খণ্ড, কলিকাতা, ব্যানার্জী পাবলিশার্স, ১৯৫৫।